বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র

জুলাই-আগষ্ট ১৯৭৯
দাম : ৫০ পয়সা

● বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদকের বিবৃতি—১ ● পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ : অতীত ও বর্তমান—৪
● মহাকাশে ভারতবর্ষ—১১ ● গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী—দাসত্বের না মুক্তির দিশারী ?—১৩

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত সম্পাদকের বিবৃতি

মাননীয় অতিথি, সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার এই দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন সভায় উপস্থিত আপনাদের সকলকে আমি আমার ও সংস্থার কার্যনির্বাহী সমিতির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই।........

........আসুন, এবার দেখা যাক বিগত ১৯৭৮-'৭৯র বছরটিতে সংস্থা আপনাদের ও অন্যান্য সহমর্মী বন্ধুদের সহযোগিতায় কি কি কাজ সম্পন্ন করেছে বা হাতে নিয়েছে।

(১) আমাদের দ্বিমাসিক মুখপত্র "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"র সাথে আশা করবো আপনারা সকলেই পরিচিত। গত বছর নতুন কার্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হবার পর একটি পুনর্গঠিত উপসমিতি "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"র পরিচালনভার গ্রহণ করেছে। ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে পত্রিকাটি কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে।.......

(২) শুধুমাত্র সংস্থার পরিচিতির জন্যই নয়, সুষ্ঠু ও সঠিকপথে বিজ্ঞানকে সামাজিক প্রগতির পথে পরিচালিত করার জন্য আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা সর্বগ্রাহ্য। তাই, সংস্থা তার জন্মাবধিই আলোচনাচক্রের আয়োজন করে আসছে। কিন্তু বিগত বছরে এ কাজের দায়িত্ব অনেকখানি সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে জুলাই-এ গঠিত একটি আলোচনাচক্র উপসমিতি। ফলে সংস্থা এ পর্যন্ত মোট চারটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত করতে পেরেছে।........

........আমাদের আয়োজিত আলোচনাচক্রের বিস্তারিত বিবরণ ইতিমধ্যেই নিশ্চয় আপনারা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র পাতায় দেখেছেন।

(৩) এদেশে বিজ্ঞানের অপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের নিষ্ঠুর সাক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ১৯৭৮-এ পশ্চিমবঙ্গের বন্যা। সুষ্ঠু নদী পরিকল্পনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য বাধাগুলি কি ও কোথায় তা চিহ্নিত করার জন্য আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে ঠিকই কিন্তু রাজ্যব্যাপী অগণিত দুর্গত মানুষের আশু ত্রাণের কাজ সেজন্য অপেক্ষা করতে পারে না। বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সদস্যরা সকলেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন দুর্গত মানুষদের

পাশে দাঁড়াতে। সংস্থা নিজে কোন ত্রাণকার্য পরিচালনা না করলেও সদস্যদের মাধ্যমে কয়েকটা ত্রাণকার্যে সহায়তা করেছে। এছাড়া রাজ্যব্যাপী ত্রাণকার্যের বিশাল প্রচেষ্টায় আমাদের সংহতি প্রকাশের নমুনা হিসাবে যৎসামান্য ২১১ টাকা সংগ্রহ করে সংস্থা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা দিয়েছে।

(৪) পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বিভিন্ন স্বয়ংশাসিত গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও ঐসব প্রতিষ্ঠানে 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্কের অবসানকল্পে ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯তে সাহা ইনষ্টিটিউটে আয়োজিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে জন্ম হয়েছে "স্বয়ংশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন সমূহের যুক্ত আন্দোলন কমিটি" বা জ্যাকারি (JACARI)। এই উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার এক সক্রিয় অংশীদার হতে পেরে আমরা আনন্দিত এবং প্রতিশ্রুতিমত সংস্থা JACARI'র সাফল্যের জন্যও সচেষ্ট। আপনারা বোধহয় জানেন যে উক্ত যুক্ত আন্দোলন কমিটি ইতিমধ্যেই জরুরী অবস্থার সময়ে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত সাহা ইনষ্টিটিউটের কর্মী শ্রীমৃণাল কান্তি বসাকের পুনর্নিয়োগের দাবীতে ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে এবং ঐ একই দিনে ইনষ্টিটিউটের কর্মচারী সমিতি একটি বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেছে। আরও আশার কথা এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও JACARI'র আন্দোলনে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

(৫) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের গবেষক ও অস্থায়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রীমনোজকুমার বসুকে অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে স্বল্প নোটিশে চাকুরী থেকে সরানোর প্রচেষ্টার প্রতিবাদে সংস্থা বিভাগীয় প্রধানের কাছে একটি প্রতিবাদপত্র পেশ করে ও কয়েকজন প্রতিনিধি বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। বিভাগীয় প্রধান সংস্থাকে আশ্বাস দেন যে শ্রীবসুর জন্য অন্তত ছ মাসের একটি বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৬) যৌথ আন্দোলন ও আলোচনার জন্য অন্যান্য সংগঠনের ডাকে সাড়া দিতেও সচেষ্ট থেকেছে সংস্থা।

(ক) দীর্ঘদিন ধরে লক-আউট ঘোষিত জয়া কারখানার সংগ্রামী শ্রমিকদের প্রতি অন্যান্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সঙ্গে আমরাও জানিয়েছি নৈতিক সমর্থন।

(খ) কলেরা রিসার্চ সেন্টারে দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

(গ) ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনে অবস্থিত চণ্ডীগড়ের সেন্ট্রাল সায়েন্টিফিক ইনষ্ট্রুমেন্টস অর্গানাইজেশনের ইউনিটের এক কর্মীকে অনির্দিষ্ট কারণে বরখাস্তের প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত দুটি CSIR প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সমিতি ও CSIR কর্মচারী ফেডারেশনের সঙ্গে আমাদের সংস্থাও সামিল হয়েছিল। আনন্দের কথা যে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহৃত হয়েছে।

(ঘ) রাজ্যের বিদ্যুৎপরিস্থিতি বিষয়ে সাঁওতালডিতে আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে সংস্থা প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল।

(৭) আপনারা নিশ্চয়ই কার্যনির্বাহী সমিতির সঙ্গে সহমত হবেন যে একটা সামগ্রিক বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্যেই সংস্থার সমস্ত কাজ পরিচালিত হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আর উৎপাদনের কাজে বিজ্ঞানের ব্যাপক ও সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং একটি সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক চেতনার পরিমণ্ডল গড়ে তোলাই হবে এই আন্দোলনের আদর্শ। কিন্তু সংস্থার সামর্থ্য ও সংগঠন আপাতত খুবই সীমিত। এই পরিস্থিতিতেও আমরা বিজ্ঞান-আন্দোলনে কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি তা খতিয়ে দেখে একটা সম্ভাব্য কর্মসূচীর রূপরেখা তৈরী করার উদ্দেশ্যে গত আগষ্ট মাসে একটি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে। উপসমিতি প্রথমে বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে একটি আবেদন রাখে। তাতে অবশ্য খুব অল্পই সাড়া মেলে। তারই ভিত্তিতে কিছু সংগঠন ও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা-পর্যালোচনা এখনও চলছে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এ ধরনের কার্যকলাপ সম্পর্কে উপসমিতি তথ্যাদি যোগাড় করছে। কেরলে 'শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদে'র নেতৃত্বে বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজ বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। নভেম্বর, ১৯৭৮ এ ত্রিবান্দ্রমে 'শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' যে সর্বভারতীয় সম্মেলনের

আয়োজন করেছিল সংস্থার ত্বজন প্রতিনিধি তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনের ফলশ্রুতি হিসেবে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বোম্বাই থেকে 'Peoples Science Movement Newsletter' প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার একটি ছোট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে একটি বলিষ্ঠ বিজ্ঞান আন্দোলনের বীজ বপনের উপযোগী পন্থা সংস্থা খুঁজে বের করতে সমর্থ হবে। তবে এজন্য উৎসাহী সকলের এবং বিশেষভাবে সংস্থার সদস্যদের উদ্যোগ গ্রহণ ও সহযোগিতা দেওয়া অবশ্য পূরণীয় প্রাথমিক সর্ত।

(৮) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থাটা কি তা খতিয়ে দেখাটা যে আমাদের বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণে একান্ত প্রয়োজনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতদিন আমরা এই প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিয়ে উঠতে পারিনি। তবে আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে একটি প্রকাশক সংস্থা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে আমরা সম্প্রতি এই ভারটি নিজেদের কাঁধে নিয়েছি। আগামী মাস ত্বয়েকের মধ্যে এবিষয়ে আমাদের একটি নিবন্ধ রচনা করতে হবে। আশা করি আপনাদের সকলের সহযোগিতায় কাজটি আমরা সুসম্পন্ন করতে পারব।

গত এক বছরে সংস্থা যা করতে পেরেছে বা করতে উদ্যোগী হয়েছে তার মূল দিকগুলি আমি এখানে উল্লেখ করলাম মাত্র।

.......১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য ন্যূনতম যে কর্মসূচী প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষিত হয়েছিল, এক বছরে সংস্থা তার সবগুলি করে উঠতে পারে নি ঠিকই, তবে কয়েকটি দিকে আমাদের কর্মধারা বিস্তৃতিও লাভ করেছে। তাই বলে, আমাদের আত্মসন্তুষ্ট হবার অবকাশ নেই। নানা ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি যেমন আছে, তেমনি আছে সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ একটি কর্মসূচী হাতে নেওয়ার ক্ষেত্রে আংশিক ব্যর্থতা। ....কিছুটা উন্নতি সত্ত্বেও 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'কে আরও পুষ্ট, উন্নত, সহজ ও আকর্ষক করে তোলার লক্ষ্য এখনও দূরে। সহজ ভাষায় বিজ্ঞান ও সমাজের মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে গ্রামে-গঞ্জে শহরতলীতে আলোচনা বিতর্ক অনুষ্ঠিত করা এখনও সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি অনেক উৎসাহী কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা, এবং এমনকি, সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত ও সক্রিয় যোগাযোগও এখনও গড়ে ওঠে নি। গত বছরে সদস্যসংখ্যা প্রায় ১৯০ থেকে প্রায় ২৩০-এ উঠলেও মোটের উপর সংস্থা এখনও নাগরিক পরিসরে সীমাবদ্ধ। ছাত্র-তরুণ ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির নীচু তলার কর্মীদের কাছে সংস্থা এখনও প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। এইসব ত্রুটির জন্য কার্যনির্বাহী সমিতি নিশ্চয়ই আংশিকভাবে দায়ী; কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের আরও উদ্যোগী ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার যথেষ্ঠ অবকাশ আছে, তবে উৎসাহী কর্মীর অভাব এবং প্রয়োজনীয় জায়গাসহ স্থায়ী অফিসঘর ও কিছু আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদির অভাবও কম অনুভূত হচ্ছে না। আমি এদিকে আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ....প্রসঙ্গক্রমে, সাংবিধানিক ত্ব একটি ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার ও কার্যনির্বাহী সমিতির পক্ষ থেকে ত্বঃখ প্রকাশ করতে চাই।.......

.......আপনারা নিশ্চয়ই জানতে আগ্রহী হবেন আগামী বছরের জন্য ন্যূনতম কর্মসূচীর কি পরিকল্পনা কার্যনির্বাহী সমিতি করেছে। সেই বিষয়ের উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

(১ বিজ্ঞান আন্দোলন—আমাদের সমস্ত কাজই যদিও বিজ্ঞান-আন্দোলনের সহায়ক ও পরিপূরক হতে বাধ্য, তবুও এব্যাপারে এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিতে হবে।

(ক) সায়েন্স ক্লাব ও অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সংগঠন ও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

(খ) সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা ক্লাব ইত্যাদির উদ্যোগে স্থানীয় ভিত্তিতে বক্তৃতার আয়োজন করা দরকার।

(গ) গ্রামীণ কারুবর্গের (Craftsmen) কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে সম্প্রতি বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ (CSIR) উদ্যোগী হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটিও গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রয়োগে উৎসাহী। কোন নির্দিষ্ট প্রকল্প অনুযায়ী এঁদের সহযোগিতায় কাজ করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

(ঘ) স্লাইড মডেল, ছবি ও পুস্তিকা সহযোগে প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক জনবোধ্য আলোচনাদি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ

ইতিমধ্যেই কয়েকজন সদস্য নিয়েছেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে।

(৬) সহজ পদ্ধতিতে ও সস্তায় রক্ত মল মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থাদি, স্বেচ্ছামূলক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ব্যাপক জনগণের উপকারের জন্য কাজে লাগানোর এক পরিকল্পনা এখন আলোচনাধীন রয়েছে। উপযুক্তভাবে এটি রূপায়ন করতে পারলে বিজ্ঞান-আন্দোলন তাৎপর্যময় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

(২) গত ২২শে ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা স্থানীয় ভিত্তিতে সংস্থার এক একটি ইউনিট গড়ে তোলার প্রস্তাবকে কার্যকর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এভাবে সংস্থার ভৌগোলিক বিস্তৃতি যাতে ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তিন বা ততোধিক সদস্য একটি 'ইউনিট' গড়ে তুলতে পারেন। স্থানীয় ভিত্তিতে স্বাধীন কর্মসূচী রূপায়নের মাধ্যমে ইউনিটগুলি কার্যকরী ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। আমি এদিকে সদস্যদের মনোযোগ দিতে অনুরোধ জানাই।

(৩) স্বয়ংশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মূলত JACARI-র মাধ্যমে ও অন্যত্র তাঁদের সহযোগিতায় বিজ্ঞানকর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের আন্দোলন আরও ব্যাপক ও অর্থবহ করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা উচিত।

(৪) আলোচনাচক্রের আয়োজন আরও বেশী মনোযোগ দাবী করে।

(৫) বিজ্ঞান-গবেষকদের নানাবিধ সমস্যা ও বিজ্ঞানের সমাজমুখীনতার সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গবেষকদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়ার প্রতিশ্রুত কাজটিতে এখনও তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। সংস্থার গবেষক সদস্যদের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় আগামী বছরে একাজে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া যাবে আশা করা যায়।

নানাবিধ শোষণ ও কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ ক্রমশ বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা ও প্রক্রিয়াকে ধারণ, পালন ও গ্রহণ করার উপযোগী নিশ্চয়ই হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানকর্মীদের ভূমিকা সেখানে অসামান্য। এই গুরুদায়িত্ব পালনে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার ক্ষুদ্র ভূমিকা ক্রমশ আরও স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়ে উঠবে, আপনাদের সকলের সঙ্গে সমস্বরে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবং আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(স্বাঃ) রবীন মজুমদার

[স্থানাভাবে মূল বিবৃতিটির কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলী]

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ—অতীত ও বর্তমান

[The nature and extent of the current power crisis in West Bengal has been discussed. The long-term problem of planning and the more immediate problems of mechanical failure and poor peformance of the generating units have been explained.]

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সমস্যা। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় কটি একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। পঃ বঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহকারী সংস্থা চারটি : (১) পঃ বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (এস. ই. বি.), (২) ক'লকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন (সি. ই. এস. সি.), (৩) দুর্গাপুর প্রজেক্টস্ লিমিটেড (ডি. পি. এল.) এবং (৪) দামোদর ভ্যালী করপোরেশন (ডি. ভি. সি.)। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে পঃ বঙ্গকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় : উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ—মাঝখানে গঙ্গা এদের মধ্যে সীমানাচিহ্ন।

ভৌগোলিক ও আনুষংগিক কিছু সুবিধার নিরিখে তাপ-বিদ্যুৎ হল পঃ বঙ্গের মূল বিদ্যুৎ উৎস। তবে উত্তরবঙ্গে অল্প জল-বিদ্যুৎ এবং খুব সামান্য ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাও আছে। নীচের ছকে বিভিন্ন উপায়ে উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

পারে।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, এই ঘাটতি আজ আর শুধু পঃ বঙ্গেই নয়, ভারতের বেশ ক'টি রাজ্যেই ঘাটতি চলছে। আর যদি গত তিন চার বছরের হিসেব নিই, তা'লে দেখবো ঘুরে-ফিরে ভারতের সব ক'টি রাজ্যই এই ঘাটতির কবলে

ছক : ১

উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রকৃতি	প্রতিষ্ঠাকালীন মোট উৎপাদনের ক্ষমতা (MW)	মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতার শতাংশ	বর্তমান-উৎপাদনের নিরিখে মোট ক্ষমতা (MW)
তাপ-বিদ্যুৎ	১৬২৩'৬৫০	৯৩.৩%	৮০০
জল-বিদ্যুৎ	৯৬'৫০৮	৫.৬%	৫
অন্যান্য	০'০৭৮	১'১%	১১
মোট	১৭৪০'২৩৬	—	৮১৬

উপরের হিসেবে ডি ভি. সি-র পশ্চিমবঙ্গ এলাকার উৎপাদনও ধরা হয়েছে, যার পরিমাণ তাপ-বিদ্যুৎ ২৯০ MW এবং জল-বিদ্যুৎ ৬০ MW। কোনও বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট থেকে যথাযথ কাজ পেতে হলে সাধারণত তার মোট উৎপাদন ক্ষমতার ৬০% এর বেশী একসাথে ব্যবহার করা হয় না। এই হিসাবে এ রাজ্যে বিদ্যুতের সরবরাহ ক্ষমতা ১০০০ MW মত হওয়া উচিৎ। আর গত মাস তিনেক যাবৎ বস্তুতপক্ষে যতটা উৎপাদিত হচ্ছে সেই হিসেবে এই পরিমাণ ৭০০ থেকে ৭৫০ MW এর বেশী হবে না। তাহলে বর্তমানে পঃ বঙ্গের বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ কত? সত্যি কথা বলতে কি এর ঠিক-ঠাক উত্তর কেউই দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ। কারণ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের দেওয়া হিসেবে বিস্তর ফারাক। আর উৎপাদনের পরিমাণ কাগজে পত্রে যা ঘোষিত হয় তার মধ্যেও একটা 'হতঃ ইতি গজঃ' ভাবের না-বলা কথা আছে। তা হল, যদি বলা হয় আজ অমুক ইউনিটে ১০০ MW উৎপন্ন হয়েছে তবে তার অর্থ উৎপাদনের মাত্রা সর্বোচ্চ ১০০ MW স্পর্শ করেছিল। অথচ কতক্ষণ এই উৎপাদন মাত্রা বজায় ছিল তা জানানো হ'ল না। যাই হোক বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া হিসাব মিলিয়ে মনে হয় যে গত কয়েক মাসের সংকটের পর্যায়ে গড় ঘাটতি ৩০০ MW এর কাছাকাছি। কিছু সরকারী সূত্রের হিসেবে ঘাটতির পরিমাণ এর চাইতেও বেশী হ'তে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এ থেকে প্রতীত হয় আমাদের মত দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণের গতিপ্রকৃতি যে খাতে বয় তাতে এ ধরণের সম্ভাবনা শুধুমাত্র একবারই নয়—বারে বারের জন্যই থাকে। বরং বলা ভাল, এরকম বার বার সংকট পাকিয়ে ওঠার জন্যই যেন সমস্যা সযত্নে লালিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সমস্যাকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমটা দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা সংক্রান্ত—বছরের পর বছর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মোট উৎপাদন ক্ষমতা না বাড়ার সমস্যা। আর দ্বিতীয়, যেটুকু সরবরাহক্ষমতা রয়েছে সেটুকুও অব্যবস্থা আর যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য কার্যকর না হওয়ার সমস্যা। অবশ্য উৎপাদন ক্ষমতার চাইতে চাহিদা যখন অনেক বেশী তখন দ্বিতীয় সমস্যাটাও তীব্র হতে বাধ্য।

বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা:

প্রথমে স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে পঃ বঙ্গে বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখাটি সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক। প্রথম পরিকল্পনা শুরু ১৯৫১ সালে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত পরিকল্পনার গতি যেভাবে বদলেছে তাতে একে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়

প্রথম পরিকল্পনা থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ অবধি। অর্থাৎ ১৯৫১ থেকে ১৯৬৬ সাল অবধি। পরবর্তী পর্যায় এর পর থেকে আজ পর্যন্ত। প্রথম পরিকল্পনায় সাধারণভাবে শিল্প অপেক্ষা কৃষিক্ষেত্র অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এসে এর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ঝোঁক পড়ে বেশী। এই সাধারণ ভিত্তি থেকেই বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে পরিকল্পনাকারগণ ঘোষণা করেন আগামী দিনে শিল্পোন্নয়নের হারের সাথে তাল রাখতে সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি পাঁচ বছরে দ্বিগুণ করতে হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে পঃ বঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সংযোজন খুবই অল্প ছিল—মাত্র ২৫-৩০ MW এর মত। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা বেড়ে হয় ২১০ MW এর মত। এর মধ্যে ডি. ভি সি'র উৎপাদন ১৫০ MW এবং ডি. পি. এল. ৬০ MW। কিন্তু এই সংযোজন সত্ত্বেও এ অঞ্চলের চাহিদা মিটল না। তাই তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাওয়ার সেক্রেটারী 'সচদেব' এর নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োজিত হয়—সারা পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একটি রিপোর্ট দেবার জন্য।

এই রিপোর্টের বিষয়বস্তুতে যাবার আগে এক নজরে সারা ভারতের বিদ্যুৎ পরিস্থিতিটা একবার দেখে নেওয়া যাক। নীচের ছক থেকে দেখা যাবে কোনো পরিকল্পনা কালেই সারা ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

ছক : ২

সময়কাল	উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজন (হাজারের MWতে)		
	পরিকল্পিত	অর্জিত	শতকরা ঘাটতি
১৯৫০-৫১	—	—	—
১৯৫১-৫৬	১ ৩০	১'১০	১৫'৪%
১৯৫৬ ৬১	৩'৫০	২'২৫	৩৫'৭%
১৯৬১ ৬৬	৭'০৫	৪'৫২	৩৫ ৮%
১৯৬৬-৬৯	৫'৪৩	৪'১২	২৪'১%
১৯৬৯-৭৪	৯'২৬	৪'৫৮	৫০'০%
১৯৭৪ ৭৯	১৬'৫০	১০'১৫	৩৮ ৫%

পরিকল্পিত ও প্রকৃতপক্ষে অর্জিত পরিমাণের মধ্যে বছর বছর ফারাকের ফলে বিদ্যুৎ ঘাটতির সম্ভাবনা সব সময়ই ছিল এবং কার্যতঃ এখানে ওখানে বিভিন্ন সময়ে ঘাটতি দেখাও দিয়েছে। এর ফলে শিল্পোন্নয়নের গতি স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারের অধিকর্তা শ্রীএ. লাহিড়ী এবং বৈজ্ঞানিক শ্রীএ ঘোষালের জার্ণাল অফ পাওয়ার এণ্ড রিভার ভ্যালী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। তাঁরা সোভিয়েত রাশিয়ার বিদ্যুৎ পরিকল্পনার উল্লেখ করে বলেছেন যে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের উৎপাদনক্ষমতাবৃদ্ধি শিল্পোন্নয়নজনিত চাহিদা বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী ছিল। অথচ আমাদের দেশে তার বিপরীতটা হওয়ার ফলে গোটা শিল্পায়নের প্রক্রিয়াটাই আজ বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

এবার পঃ বঙ্গের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। 'সচদেব কমিটি' তার রিপোর্টে বলেছিল যে এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে নিহিত উৎপাদনক্ষমতার কোনও অংশকে বিশ্রাম না দিয়ে একটানা কাজ করানোর ফলে বেশীর ভাগ যন্ত্রপাতিই প্রচণ্ডরকম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অবশেষে সব দিক বিবেচনা করে এই কমিটি পঃ বঙ্গের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণ থেকে আরও ১৯০ MW বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ রাখেন। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় পঃ বঙ্গে সংযোজন হয় মোট ৭৫৫ MW (ডি পি এল. ২২১ MW, ডি. ভি. সি. ১০০ MW এবং ব্যাণ্ডেল ৩২০ MW)। এই প্রথম এবং শেষ বারের মত পঃ বঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি কিছুটা সন্তোষজনক অবস্থায় আসে। এই হল বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা এবং প্রণয়নের প্রথম পর্যায়।

এর পরের পর্যায়ের সার কথা একটিই। তা হল বিদ্যুতের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অবহেলা। ১৯৬৬ থেকে আজ পর্যন্ত বছর কেটেছে তেরটি আর পঃ বঙ্গে বিদ্যুৎ উন্নয়ন ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন হয়েছে মাত্র ৩৯৭ MW। অর্থাৎ বছরে গড়ে ৩০'৫ MW এর মত। নীচের ছকে ১৯৫৬ থেকে আজ পর্যন্ত বছর বছর পঃ বঙ্গের বিদ্যুতের ভাঁড়ারে কত কত পরিমাণ জমা হয়েছে তার হিসেব দেওয়া হ'ল।

ছক ঃ ৩

বছর	নতুন সংযোজন (MW)	বছর	নতুন সংযোন (MW)
১৯৫৬	৫·৬	১৯৬৮	১·০
১৯৫৭	১·৮	১৯৬৯	০ ৩
১৯৫৮	০·১	১৯৭০	১·৭
১৩৫৯	১·০	১৯৭১	৩ ৪
১৯৬০	১৩৫·৫	১৯৭২	১০ ৪
১৯৬১	৭৫·৬	১৯৭৩	১২১ ৪
১৯৬২	১০·৫	১৯৭৪	১০
১৯৬৩	৫০·৮	১৯৭৫	১২০·৫
১৯৬৪	১৫০·৬	১৯৭৬	—
১৯৬৫	৬৮·৮	১৯৭৭	—
১৯৬৬	৩৭৫·১	১৯৭৮	১২০·০
১৯৬৭	১৮ ১		

বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৬৬-৬৭'র পর থেকে দেশের গোটা অর্থনীতিতেই নানারকম সংকট আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। শিল্পায়নের হার প্রচণ্ডরকম কমে যাওয়া তার মধ্যে অন্যতম। শিল্পের প্রসার কম হওয়ায় বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে ধীর গতিতে কিন্তু সেটুকু চাহিদাও না মেটার ফলে শিল্পায়ণ প্রক্রিয়া আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৬৬-৬৭'র পর থেকে পঃ বঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে নীট বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষমতা আদৌ বাড়ে নি বললে খুব ভুল হবে না।

যান্ত্রিক গোলযোগ ঃ

এবার আলোচনার দ্বিতীয় অংশে আসা যাক। ঘন ঘন যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ উদ্ভূত সমস্যা এর বিষয়বস্তু। গোড়াতেই ব'লে নেওয়া দরকার যে উৎপাদনক্ষমতা যদি চাহিদা অনুযায়ী থাকে তাহলে যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে ঘাটতি মাঝে মধ্যে হয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু যদি এমনিতেই ঘাটতি এলাকা হয় তো সমস্যা তীব্রতর হবে। যেমন আজ পঃ বঙ্গের অবস্থা।

প্রথমে দু'চার কথায় একটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল কাজ-কর্মের আন্দাজটা দেওয়া যাক। তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার মূল ভিত্তিটা হল, জ্বালানী পুড়িয়ে যে তাপ-শক্তি সৃষ্টি হয় তাকে ব্যবহার করে প্রথমে টারবাইনের সহায়তায় যান্ত্রিক শক্তি এবং পরে বিদ্যুৎ শক্তি পাই জেনারেটার থেকে। এজন্য প্রকৃতিভেদে পুরো কাজটাকে কতকগুলি অংশে ভাগ করা যায়।

প্রথম, চুল্লী ও তৎসংশ্লিষ্ট অংশ। কয়লা একস্থানে জমা থাকে, সেখান থেকে তাকে বয়ে এনে চুল্লীর মধ্যে দেওয়া হয়। দহন সম্পূর্ণ হলে পড়ে থাকা ছাই এবং উদ্ভূত গ্যাস নির্দিষ্ট পথে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এজন্য প্রয়োজন—কয়লা বাদে, বাতাস এবং চুল্লী ধরাবার জন্য জ্বালানী তেল। এজন্য যন্ত্রপাতি যা ব্যবহৃত হয় মোটামুটি তা হল—কোল ফীডার, কনভেয়ার, সাইজার, পালভারাইজার, এয়ার ব্লোয়ার, অয়েল রিজার-ভয়ের, অয়েল বার্ণার, অ্যাশ কালেক্টর, ডাস্ট কালেক্টর ইত্যাদি।

দ্বিতীয়, বয়লার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি দ্বারা জল ফুটিয়ে বাষ্প করা হয় এবং তা দিয়ে টারবাইন ঘোরানো হয়। একটি আধারে রক্ষিত জল পরিশোধিত করে বয়লার ড্রামে নেওয়া হয়। এখানে প্রথমে বাষ্প এবং পরে তাকেই উচ্চ তাপমাত্রায় উচ্চ চাপের বাষ্প করা হয়। এই উচ্চ চাপের বাষ্পকে নিয়ে গিয়ে টারবাইন ব্লেডের ওপর আঘাত করলে টারবাইন-রোটর ঘোরে। চাপযুক্ত বাষ্প টারবাইন থেকে বার করে এনে এর তাপ বার করে নিয়ে জলে পরিণত করা হয় এবং সেই জলকেই পুনরায় একই চক্রাকার পথে ব্যবহার করা হয়। এ কাজের জন্য যে সমস্ত ইউনিট আছে তা হল—ওয়াটার ট্যাঙ্ক, ওয়াটার পিউরি-ফায়ার, ইভাপোরেটর, কনডেনসার, প্রি-হিটার, বয়লার ফীড পাম্প, ইকনমাইজার, বয়লার ড্রাম, বয়লার টিউব, সুপার-হিটার টিউব ইত্যাদি।

তৃতীয়, টারবাইন ও জেনারেটার ইউনিট। টারবাইনের একই শ্যাফ্‌টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে জেনারেটারের রোটর। টারবাইনের প্রবেশ পথে বাষ্পের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। বাষ্প প্রবেশ করানোর আগে টারবাইন ঘোরাবার জন্য প্রয়োজনীয় মোটরের ব্যবস্থা থাকে। জেনারেটারে ঘর্ষণে উদ্ভূত তাপ মুক্ত করতে হাইড্রোজেন গ্যাস বা জল ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ ঃ গভারনার, অয়েল পাম্প, গিয়ার্ড মোটর, ইমারজেন্সী ট্রিপ, একসাইটর, হাইড্রোজেন গ্যাস অথবা ওয়াটার কুলিং সিস্টেম ইত্যাদি।

চতুর্থ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ঃ উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে সরবরাহের জন্য নানান ব্যাবস্থা থাকে। এগুলি হল—মেইন ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার, সার্কিট ব্রেকার, আইসোলেটর, কারেন্ট ট্রান্সফরমার, রীলে ইত্যাদি।

পঞ্চম, মাপক ও নিয়ন্ত্রক যন্ত্রাদি। জ্বালানী সরবরাহ ও পোড়ানো থেকে আরম্ভ করে জল গরম করা, বাষ্প করা, টারবাইনে পাঠানো, ফেরৎ আনা এসবের প্রতিটি স্তরে প্রকৃত অবস্থা ও পরিমাণ জানার জন্য এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাপারটিকে সামাল দেবার জন্য আছে শত-সহস্র স্বয়ংক্রিয় এবং আধাস্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে যেখানে বসে একজন লোক পুরো প্ল্যান্টের যেকোনো স্থানের অবস্থাটা জেনে নিতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন। যে সমস্ত জিনিষ মাপতে হয় তা হল—টেম্পারেচার, প্রেসার ফ্লো, স্ট্রেস, ভাইব্রেশন, ভোল্টেজ, কারেন্ট, ফ্রিকোয়েন্সী, পাওয়ার ফ্যাক্টর, ওয়াটেজ, ওয়াট-আওয়ার ইত্যাদি।

এতসব কাজের স্তর এবং ফিরিস্তি থেকে অনুমান করা শক্ত নয় কেমন জটিল পুরো ব্যবস্থাটা। আর এই তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়াটা এখনও সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় করা সম্ভব হয়নি। তাই প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন অত্যন্ত সজাগ এবং সতর্ক দৃষ্টির।

সাধারণভাবে আমাদের দেশের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির কার্যদক্ষতা (Operational Efficiency) খুবই নিম্নমানের। এর পরিমাণ ৪০-৫০% এর বেশী নয়। পঃ বঙ্গের ক্ষেত্রে এরও কম। এই কার্যদক্ষতা বলতে বোঝান হয় প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনক্ষমতার কতখানি ব্যবহার করা যাচ্ছে তার শতকরা পরিমাণ। বিদেশে এই মান ৮০ শতাংশ অবধি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে বলে দাবী করা হয়।

পঃ বঙ্গের তাপ বিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলির ঘন-ঘন যান্ত্রিক গোলযোগ এবং পরিণতিতে সামগ্রিক কার্যদক্ষতার অবনতির জন্য সাধারণভাবে যেসমস্ত বিষয়গুলিকে দায়ী বলে মনে করা হয় সেগুলি হল—(১) কয়লার নিম্নমান; (২) প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচর্যার অভাব; (৩) উদ্বৃত্ত উৎপাদনক্ষমতা না থাকা; (৪) যন্ত্রাংশের অভাব; (৫) যথেষ্ট কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অপ্রতুলতা; এবং (৬ কাজে গাফিলতি। নীচে সংক্ষেপে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

(১) **কয়লার নিম্নমান ঃ** কাঠ থেকে কয়লায় রূপান্তরের বিভিন্ন স্তরকে যথাক্রমে এইভাবে ভাগ করা যায়—কাঠ, পীট, লিগনাইট, বিটুমিনাস, আধা-বিটুমিনাস, আধা-এনথ্রাসাইট, এনথ্রাসাইট ও গ্রাফাইট। এর মধ্যে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের জন্য সাধারণভাবে বিটুমিনাস কয়লাই ব্যবহৃত হয়। কয়লা পরিশোধনে প্রস্তুত কোক-কয়লা স্টীল প্ল্যান্টে ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হয় এবং এই পরিশোধনাগারের ঝড়তি-পড়তি কয়লাই সরবরাহ হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। এছাড়া নিম্নমানের কয়লা সরাসরি বিদ্যুৎকেন্দ্রে আসে। কয়লার মধ্যকার উপকরণগুলি হ'ল কারবন, উদ্বায়ী গ্যাস, মিশ্র খনিজ পদার্থ এবং জলীয় বাষ্প। কারবন এবং উদ্বায়ী গ্যাস হল এর জ্বালানী অংশ। কয়লা পুড়ে অবশিষ্ট যে অংশ থাকে তাকে 'ছাই' বলে। কয়লায় এই ছাইয়ের পরিমাণের ওপর কয়লার গুণ নির্ভর করে। ছাইয়ের ভাগ বেশী হওয়ার অর্থ এক একক পরিমাণ তাপ উৎপাদনের জন্য বেশী কয়লা লাগা। আর ছাইয়ের ভাগ বেশী হলে প্রজ্জ্বলিত চুল্লী থেকে উত্থিত ফ্লুগ্যাসের মধ্যে ভারী কণিকার ভাগ বেশী হবে এবং বয়লার টিউবের দেওয়াল ফ্লু-গ্যাসের ধাক্কায় আরও দ্রুতহারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে ঘন ঘন বয়লার টিউব ফুটো হবার ঘটনা ঘটে। কয়লার মান অর্থাৎ কয়লায় ছাইয়ের ভাগ বেশী হলে ক্ষতি হয় তিন ভাবে। এক প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন। ফলে উৎপাদন দক্ষতা হ্রাস পায়। দুই, বেশী পরিমাণ কয়লা নাড়াচাড়া, পরিবহণ এবং গুঁড়া করার প্রয়োজন হওয়ায় বেশী বিদ্যুৎশক্তি ব্যয় হয় এবং মেশিন-পত্রের ব্যাবহারিক ক্ষয়ের হার বৃদ্ধি পায়। তিন, বয়লার টিউবের ক্ষতির ফলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি হয়।

ব্যবহৃত কয়লার মান সামান্য একটু উন্নত করতে পারলে কি পরিমাণ জ্বালানী তথা অর্থের সাশ্রয় হতে পারে তার একটা আন্দাজ দেওয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত কয়লায় ১০০০ কিলোওয়াট আওয়ার (KWh) বিদ্যুতের জন্য কয়লার খরচ ০.৮ টন। এখন পশ্চিমবঙ্গে গত বছর যে আনুমানিক ৬৫০০ মিলিয়ন KWh বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে

তার মধ্যে যদি তাপ-বিদ্যুতের পরিমাণ হয়ে থাকে ৬০০০ MKWh, তবে এজন্য যে কয়লার প্রয়োজন হয়েছে ৪৮ লক্ষ টন। এখন এই ০·৮ টন হারের বদলে তা যদি ০·৬ টন করা যেত তবে কয়লার সাশ্রয় হত ১২ লক্ষ টন। পরিমানটা নিতান্ত কম নয়। তবে কয়লা তো প্রাকৃতিক সম্পদ। মনে হতে পারে এতে আর আমাদের হাত কি? এই প্রসংগে J. Power & River Valley Development পত্রিকার ১৯৭১ সালের নভেম্বর সংখ্যার একটি মন্তব্য অনুবাদ করে দিচ্ছি:

"কয়লা ব্যবসায়ে ভেজালের ব্যাপারটা আমাদের অতি-পরিচিত। এর জন্য কয়লা যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে সেখানে কয়লার গুণ যাচাই করার প্রক্রিয়া আরো কঠোর হওয়া উচিৎ।" অর্থাৎ ইচ্ছে করলেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য একটু ভাল মানের কয়লা সংগ্রহ করা সম্ভব। এখানে উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশে কয়লা উৎপাদন ব্যবস্থা জাতীয়করণ হলেও এখনও বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়লা সরাবরাহের জন্য নিযুক্ত রয়েছে কনট্রাক্টরগণ।

তবে কয়লার এই সমস্যা অল্পবিস্তর পৃথিবীর তাবৎ তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রেরই। একাজে পরিশোধিত কয়লার ব্যবহারও সম্ভব নয় খরচের মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাবে বলে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নানান প্রক্রিয়া অবলম্বনে উন্নত সেগুলি উৎপাদনদক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতবর্ষে এধরণের প্রচেষ্টা বিশেষ নেই।

(২) **উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব:** পরিচর্যা ও মেরামতির কাজটি দু'ধরণের। একটি নিত্যনৈমিত্তিক টুকিটাকি মেরামতি। আর অপরটি নির্দিষ্ট একটি সময়ের ব্যবধানে সামগ্রিক পরিচর্যা ও মেরামতি। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শতসহস্র কাজের বিষয় এবং যন্ত্রপাতি ও মেশিনগুলিকে গুরুত্বানুসারে কতগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, কতগুলির বিগ্‌ড়াবার সম্ভাবনা সব সব সময়ই বেশী আবার কতগুলি বিগ্‌ড়োলে পুরো ব্যাবস্থাটাই হয়তো বানচাল হতে পারে। সেই অনুসারে এই তদারকির কাজটি করা প্রয়োজন। খুব কম সংখ্যক যান্ত্রিক গোলযোগই হঠাৎ হয়। সাধারণত এমনটি হবার আগে যথেষ্ট জানান দিয়েই হয়। অতএব ইংগিত বুঝে সম্ভাব্য গোলযোগের আগেই হস্তক্ষেপ করলে অনেক বিভ্রাটই ঠেকানো যায়। আর নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে সামগ্রিক পরিচর্যার উদ্দেশ্য হল—মেশিন পত্রগুলিকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দেওয়া এবং প্রতিটি অংশ পরীক্ষা করে প্রয়োজনবোধে মেরামতি করা। তবে এই পরিচর্যার কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে কয়েকটি মূল যন্ত্রের ক্ষেত্রে। যেমন, বয়লার, টারবাইন, জেনারেটার, পাম্প ইত্যাদি। এই পরিচর্যার কাজটি নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী না হলে যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল যেমন কমে তেমনি এর নির্ভরযোগ্যতাও কমে। অর্থাৎ যন্ত্রসমূহের এলোমেলো অপ্রত্যাশিত গণ্ডগোলের মাত্রা বেড়েই চলে।

(৩) **উদ্বৃত্ত ক্ষমতা না থাকা:** সাধারণভাবে একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয় মোট প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-ক্ষমতা থেকে সবচেয়ে বড় যে ইউনিটটি আছে তার উৎপাদন ক্ষমতা বাদ দিয়ে। এর অর্থ অন্তত একটা ইউনিট বিশ্রামে আছে ধরে নেওয়া। সেই সময় ওই ইউনিটের পরিচর্যা ও মেরামতির কাজ সারা হয়। কিন্তু পঃবঙ্গের ক্ষেত্রে সে সুযোগ আজ আর নেই। কারণ চাহিদা মেটাতে সব কটি ইউনিটকেই চালানো হচ্ছে এক সাথে। আজ নয় বহুদিন থেকেই চলছে এই পন্থা। যতক্ষণ না যান্ত্রিক বিভ্রাটের ফলে সেটা বসে পড়ছে। ফলে গোলযোগের দরুণ উদ্ভুত সংকটের মাত্রা ক্রমেই বেড়েই চলেছে।

(৪) **যন্ত্রাংশের অভাব:** এটা দু'কারণে হতে পারে। প্রথমত, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সময়মত যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ না করার জন্য; আর দ্বিতীয়ত; ইচ্ছে থাকলেও সংগ্রহের অসুবিধের জন্য।

প্রথম অভিযোগটী শুধু পঃবঙ্গই নয় ভারতের প্রায় তাবৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পক্ষেই খাটে। একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং যন্ত্রাংশের শ্রেণী বিভাগ করলে তার সংখ্যা হাজার পনেরর উপরে হবে। বিচিত্র এদের প্রকৃতি, আয়তন, মূল্য। অতএব এইসব দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু সরবরাহ একটী অত্যন্ত জটিল কাজ। এজন্য আধুনিক উন্নত ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এখানকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা নিছক দায়সারা-ভাবে হয়।

আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বিদেশী মুদ্রা। এছাড়া বেশীর ভাগ ইউনিটই কোন না কোন বিদেশী সহযোগীর সাহায্য নিয়ে তৈরী হওয়ায় যন্ত্রাংশের জন্যে ঐ ঐ সহযোগীর ওপর নির্ভর করতে হয় বলে সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। আর

ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত প্রশাসনিক লালফিতে ত আছেই। অবশ্য সরকারী সংস্থা BHEL-এ যন্ত্রাংশ নির্মাণের ক্ষমতা গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও তা প্রত্যাশিত মান এবং মাত্রায় পৌছোতে সক্ষম হয়নি।

(৫) যথেষ্ট কারিগরীজ্ঞান সম্পন্ন লোকের অপ্রতুলতা: বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মত জটিল ব্যবস্থায় দক্ষ কারিগর, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। অথচ আজও তেমন কোনো সুনিশ্চিত ট্রেনিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তিগত উদ্যম এবং দৈনন্দিন ঠেকে শিখে যতটুকু অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে, কর্মীদের সম্বল সেটুকুই। একটি কাজ অন্তত করা যায়। যখন কোনো নতুন উৎপাদন ইউনিট কেনার কথা ঠিক হয় তখন ওই ইউনিটটী নির্মাণকালে যদি পর্ষদের কিছু ইঞ্জিনীয়র কারিগণ সেখানে উপস্থিত থেকে প্রতিটী স্তরের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে পরবর্তীকালে ওই ইউনিটের যে কোনো গোলযোগ এদের সহায়তায় মোকাবেলা করা সম্ভব হতে পারে। অবশ্য এমন যে কোনও পরিকল্পনাই পর্ষদের এলোমেলো নিয়োগ এবং বদলীর নীতির ফলে ব্যর্থ হতে পারে। কারণ উপরোল্লিখিত মত কজন হয়তো ছ'মাস বাইরে থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখলেন তিনি বদলী হয়েছেন "H. T. Tower" পোতার কাজে! এটী মোটেই রসিকতা নয়। অনুরূপ ঘটনা পর্ষদে আকছার ঘটছে। যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন হেড অফিসে বসে ফাইলের ওপর নোট দিলেন তাঁকেই হয়তো হঠাৎ একদিন নিয়ে গিয়ে প্ল্যান্টের চার্জে বসিয়ে দেওয়া হল। এরপর ফল যা হচ্ছে তা আর অপ্রত্যাশিত বলা যায় কিভাবে?

(৬) কাজে গাফিলতি: আমরা যারা কোন না কোন সংস্থায় কাজে নিযুক্ত তারা আমাদের চারপাশে কাজের নমুনা কেমন দেখছি? অবশ্যই সন্তোষজনক নয়। অতএব এমনক্ষেত্রে বিশেষ একটী সংস্থার মুষ্টিমেয় কিছু লোক হঠাৎ কাজে কর্মে খুব একনিষ্ঠ হবেন এমন প্রত্যাশা বোধহয় বাতুলতা। আসলে সমস্যাটা এমন বিচ্ছিন্নভাবে দেখছি বলেই এখনও আশা করছি। আমরা জানি যে কোন সমাজের স্তর এবং পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের কর্মোদ্যোগ, দক্ষতা ইত্যাদির একটী সাধারণ মান এবং সীমা নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। সেই হিসেবে আমাদের স্থানও নির্দ্দিষ্ট। খতিয়ে দেখলে সত্যিই ইতরবিশেষ নজরে আসবে না। তবু এক্ষেত্রে এদের নিয়ে এত হৈ চৈর একটীই কারণ যে এদের কাজকর্মের ধারা সমাজের একটী বৃহদংশ মানুষের ওপর সরাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া করে। একথা অনস্বীকার্য যে এমন একটী পরিবেশও যে কোনো সংস্থাতেই ন্যূনতম শৃঙ্খলা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখা যায় যদি এর প্রশাসনিক ভার যাকে কিছু সৎ এবং দক্ষ পরিচালকের হাতে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলি আজ সেই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে এর দায় আজ আর শুধু ওপর তলার আমলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই এজন্য একদম নিম্নস্তর অবধি সকল পদমর্যাদার মানুষই কমবেশী দায়ী। এই মন্তব্যের সমর্থনে দৃষ্টান্তের অভাব হবে না। তবে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এটী নয়। তাই সেই চেষ্টায় আপাতত বিরত থাকা গেল।

সীমিত পরিসরে এই প্রবন্ধে বিদ্যুৎ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এ বিষয়ে সর্বস্তরের মধ্যে আরো অনেক বেশী ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন। তবে একটী বিষয় অনুল্লিখিত রইল—তা হল পশ্চিমবঙ্গের আগামী দিনের বিদ্যুৎ ভাবনা। তার জন্য স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন।

সহায়ক সূত্রসমূহ:

(১) Statitics পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, ১৯৭৮
(২) Tenth Annual Power Survey of India, 1977.
(৩) J. Power & River Valley Development, India-র ১৯৫২ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা।
(৪) অর্থ নৈতিক সমীক্ষা. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, ১৯৭৭-৭৮
(৫) Report on Power system Planning studies; C E A, India & Teshmont Consultants Inc, Canada.
(৬) Reports & Account, 1978, C E S C.
(৭) Power station Engg. & Economy—Skrotzki & Vopat.

রবীন চক্রবর্তী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মহাকাশে ভারতবর্ষ

গত ৭ই জুন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ 'ভাস্কর' কোনও এক সোভিয়েত উৎক্ষেপনকেন্দ্র থেকে আকাশে উঠেছে। ১০ই জুনের খবরে প্রকাশ, এই উপগ্রহ ঠিকমতো তার কক্ষপথে ঘুরছে আর তার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ঠিকমতো কাজ করছে। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল ভারতবর্ষের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'কে আকাশে ছাড়া হয়েছিল—ছাড়া হ'য়েছিল একইভাবে, অর্থাৎ সোভিয়েত উৎক্ষেপন কেন্দ্র থেকেই। তখনই অনেকে অবাক হ'য়ে ভেবেছিলেন, ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হ'চ্ছে রাশিয়া থেকে, এটা কেমন কথা? প্রশ্ন উঠেছিল, ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা কি তাড়াহুড়ো ক'রে পরিকল্পনাবিহীনভাবে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়ে নাম কেনার চেষ্টা ক'রছেন না? এবারে দেখা যাচ্ছে এই পরিকল্পনাহীনতা একটা ধারাবাহিক ব্যাপার—প্রতি ক্ষেত্রেই একটা উপগ্রহ আকাশে ছেড়ে দেওয়াটাই হ'য়ে র'য়েছে মূলে লক্ষ্য, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো পেয়ে চলেছে অবহেলা। ইতিমধ্যেই, 'ভারস্কর'কে ছুঁড়ে দেওয়ার ঠিক পরেই, চুক্তি সই হ'য়ে গেছে আবার আগামী বছর পরবর্তী উপগ্রহ 'ভাস্কর-২'কে রাশিয়া থেকে আকাশে ছাড়ার বিষয়ে।

তাহলে কি ক্রমাগতই ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহগুলো বিদেশের মাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'তে থাকবে? বর্তমান অবস্থা যা তা' থেকেই মনে হ'চ্ছে যে সরকার তথা মহাকাশ সংস্থা যদি ঘন ঘন উপগ্রহ ছেড়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে চান তবে এখনও বেশ কিছুদিন এ ব্যাপার চ'লবে। কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার মতো রকেট একটা অবশ্য এদেশে তৈরী হয়েছে। এ বছরের শেষ নাগাদ সেটা হয়তো ছাড়া হতে পারে। তবে সেটার উৎক্ষেপন ক্ষমতা হবে অত্যন্ত কম। সম্ভবত সেটা একটা ৪০ কিলোগ্রাম ওজনের উপগ্রহকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে নিয়ে যাওয়ার মতো ক'রে তৈরী। একটা কার্যকর কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়তে হ'লে এর চাইতে অনেক বেশী ক্ষমতা প্রয়োজন। 'ভাস্কর'-এর ওজনই হ'চ্ছে ৪৪৪ কিলোগ্রাম, আর পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব ৫৩৫ কিলোমিটার। তাও আবার 'ভাস্কর' নেহাৎই একটা পরীক্ষামূলক উপগ্রহ। একটা পূর্ণাঙ্গ উপগ্রহ ছাড়ার মতো রকেট, বিশেষত তার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চগুণসম্পন্ন জ্বালানী বহুদিন ভারতবর্ষের নাগালের বাইরে থাকবে।

অথচ ইতিমধ্যেই ভারত মহাকাশযুগে প্রবেশ ক'রেছে বলে ঘোষিত হ'য়ে গেছে আর সেই ঘোষণার মান রাখতে পটাপট উপগ্রহ ছাড়াও জরুরী হ'য়ে প'ড়েছে। ফলে মহাকাশ গবেষণা আর তৎসংক্রান্ত কারিগরীর বিকাশটা হ'য়ে প'ড়ছে অদ্ভুতরকম একপেশে। শুধু 'আর্যভট্ট' আর 'ভাস্কর' জাতীয় উপগ্রহই নয়, অন্য আর এক ধরনের উপগ্রহও ভারত সরকার যত শীঘ্র সম্ভব আকাশে ছেড়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এগুলো 'আর্যভট্ট' বা 'ভাস্কর'এর মতো পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না, পৃথিবীর আকাশে স্থির থাকে। এগুলোর কার্যকারীতা অনেক বেশী, আর কারিগরীও অনেক বেশী উঁচু মানের। এই স্থির উপগ্রহগুলোর সাহায্যে আবহাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপক পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে ব'লে দাবী করা হ'য়েছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ এইরকম একটা উপগ্রহ আকাশে ছাড়তে চ'লেছে। না, ভারতীয় বিজ্ঞানের কোনও অবিশ্বাস্য অগ্রগতির ফলে এটা ঘটবে না। এটা আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা 'নাসা'-তে তৈরী হ'য়ে 'নাসা' থেকেই ছাড়া হবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের কাজ হবে কেবল আমেরিকাকে উপগ্রহের দামটা দিয়ে দেওয়া। ব্যাস, তাহ'লেই ভারতবর্ষ মহাকাশ গবেষণার প্রথম ধাপ থেকে দ্বিতীয় ধাপে প্রমোশন পেয়ে যাবে। আবহাওয়া সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ছাড়াও এই উপগ্রহ দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার নাকি প্রভূত উন্নতি করা যাবে। এর জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ট্রেনিং পাবেন ফ্রান্স আর জার্মানীর একটা যৌথ প্রকল্পে পর্যবেক্ষক হিসাবে থেকে। এরকমভাবে সম্পূর্ণ অন্য দুটো দেশের যৌথ প্রকল্পে পর্যবেক্ষক হিসাবে থেকে যে কী ট্রেনিং পাওয়া যাবে তা চিন্তা না করাই ভাল। অবশ্য কার্যকালে যদি দেখা যায় যে সে ট্রেনিংএ

কুলোচ্ছে না তাতেও অসুবিধে নেই, বিপদ-ত্রাতা 'নাসা' ত' রয়েছেই। কারণ 'ভারতীয়' উপগ্রহগুলো আকাশে ওঠার পরও তাদের আন্তর্জাতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখে—সেগুলো থেকে পাওয়া সঙ্কেতবার্তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ভারত সানন্দে বিদেশী 'সহযোগিতা' গ্রহণ ক'রে থাকে। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 'ভাস্কর'এর গতিবিধি যদিও লক্ষ্য করা হ'চ্ছে এদেশের ছুটো আর রাশিয়ার একটা কেন্দ্র থেকে, তবু তার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত-প্রেরক যন্ত্র যে ঠিকমতো কাজ করছে সে খবরটা এখানকার মহাকাশ সংস্থা পেয়েছে মস্কো থেকে, আর পাওয়ার পর সাংবাদিকদের কাছে সেটাকে একটা 'আনন্দদায়ক' খবর ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে (টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, ১০/৬/৭৯)।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলো কতটা পরিমাণে ভারতীয়, এগুলোর ক্ষেত্রে বিদেশী 'সহযোগিতা' নেওয়ায় জাতীয় সার্বভৌমত্ব কতটা ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছে, এগুলোর মাধ্যমে বৃহৎ শক্তিগুলো ভারত ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কতটা ক্ষুণ্ণ ক'রতে পারে সেসব অস্বস্তিকর প্রশ্ন বাদ দিলেও একটা জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। এইসব উপগ্রহ ক্ষেপণের উদ্দেশ্য কি? 'আর্যভট্ট'র ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল একটা উপগ্রহকে সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপন করা যায় কিনা, শুধু সেটুকু দেখা। 'ভাস্কর'-এর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য আর একটু বেশী— উপগ্রহ আর মহাকাশ কেন্দ্রের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান ঠিকমতো হ'চ্ছে কিনা দেখা। বলা হ'য়েছে যে এই জাতীয় উপগ্রহ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম সংরক্ষণে আর আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কাজে লাগবে। এই ছুটো দাবীকেই সন্দেহের চোখে দেখা দরকার। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে এই উপগ্রহগুলোর উপযোগীতা এখন পর্যন্ত অনুমান-নির্ভর (স্টেট্সম্যান, ৯/৬/৭৯)। আর আবহাওয়ার পূর্বাভাসে প্রয়োজন আরো অনেক বেশী উঁচু মানের কারিগরীর স্থির উপগ্রহ। আর যদি বা উপগ্রহগুলো এই ছুই কাজে ফলপ্রসূ হয় তবু জিজ্ঞাসা থাকে, কোটি কোটি টাকা খরচ ক'রে যা ফল পাওয়া যাবে তা কি আমাদের মতো দেশের পক্ষে খরচের তুলনায় যথেষ্ট? সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো এগুলোকে দেশের স্বার্থে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগানো যাবে। তার জন্যে গবেষণা আর প্রস্তুতি অবশ্য এখন থেকেই চালানো দরকার। কিন্তু যেরকম অধীর আস্ফালনের সঙ্গে এগুলোর পিছনে টাকা ঢালা হ'চ্ছে তা কি আজকের দিনের সমস্যাজর্জরিত ভারতবর্ষের পক্ষে একটা উৎকট বিলাস নয়?

অভিজিৎ লাহিড়ী

For all Electrical. Electronic Components and Equipments and any other odd items.

Please Contact

D. S. ENTERPRISES

52/9C, B. B. Ganguly Street (1st floor),

Calcutta-700 012

(We also Supply Hydrogen, Nitrogen, Oxygen & other cylinders of various capacities, Silica & Quartz tubes of different sizes)

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী ঃ দাসত্বের না মুক্তির দিশারী ?

[This is a translated reprint of the article "The Village Health Worker—Laking or Liberator ?", by David Warner, a pioner of Peopeles' Health Movement in Latin America, received by courtesy of Voluntary Health Association of India, New Delhi. We consider it to be an important document. ডেভিড ওয়ার্ণার লাতিন আমেরিকার গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক পথিকৃৎ কর্মী। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের নিরবিচ্ছিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তুলেছেন এই আন্দোলনের তাৎপর্য আর সম্ভাবনা। আমাদের দেশে গণস্বাস্থ্য আন্দোলন এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবহেলিত, এই আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য আর সম্ভাবনার দিকটাওউপেক্ষিত। কিছু দায়সারা সরকারী আর আধা-সরকারী প্রকল্পের আওতায় আটকা পড়ে রয়েছেন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই প্রবন্ধে লাতিন আমেরিকায় সরকারী প্রচেষ্টাগুলোর ব্যর্থতা তার পাশাপাশি সার্থক জনমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলোতে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে ওয়ার্ণার যা বলেছেন, আমাদের দেশে গণস্বাস্থ্য আন্দোলনে যাঁরা অংশ নিতে চান তাঁদের কাছে এটা একটা মূল্যবান দলিলের কাজ করবে। সম্পাদকমণ্ডলী]

গোটা লাটিন আমেরিকা জুড়েই ইদানীংকালে সমাজমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্পের নতুন নতুন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য সহায়কদের কাজকর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু লাটিন আমেরিকার গ্রামে-গঞ্জে স্বাস্থ্য কর্মীরা আগে আদৌ অপরিচিত ছিল না। বিভিন্ন ধর্মীয় ও স্বাস্থ্য সংস্থা বহুদিন ধরেই স্বাস্থ্য সহায়কদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। আগের চেয়ে কিছুটা কম হলেও গ্রামের মানুষেরা অনেকেই কিন্তু এখনও আগের মতই বদ্যি, কবিরাজ, হাড়ের ডাক্তার, সনাতনী ধাত্রীবিদ্যা আর ওঝার ঝাড়ফুকে বিশ্বাস করে আসছেন। শহুরে চিকিৎসকদের মতই সম্প্রতি হাতুড়ে ডাক্তাররাও গ্রামের মানুষদের একগাদা করে ওষুধ দিতে শুরু করেছে।

লাটিন আমেরিকার স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে এই অপেশাদার চিকিৎসকেরা এখনও অবহেলিত। অবশ্য বিকল্প কোন ব্যবস্থাও স্বাস্থ্য বিভাগ করতে সক্ষম হয় নি। পাশ্চাত্য কায়দায় রপ্ত শহরের এম, ডি, ডাক্তারেরা ব্যয়সাপেক্ষ ত বটেই, উপরন্তু এঁরা গ্রামে গিয়ে কাজ করতেও সরাসরি অস্বীকার করে থাকেন।

এই সমস্যা সমাধানে প্রথম সরকারী প্রচেষ্টা হল চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো। তদনুযায়ী মেকসিকোর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রতি বছর পাঁচ হাজার নতুন ছাত্র ভর্তি করা শুরু হয়; ফলে বাড়তি এক বিরাট সংখ্যায় স্বল্প দক্ষ চিকিৎসক শহরে থেকে যেতে শুরু করে।

এর পরের প্রচেষ্টাটা এল আবশ্যিক সমাজ কল্যাণের মধ্যে দিয়ে। লাইসেন্স পাওয়ার পূর্ব শর্ত রাখা হ'ল, প্রত্যেক ডাক্তারকে এক বছর গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক হিসেবে থাকতে হবে। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই সমস্ত তরুণ চিকিৎসকেরা একেবারেই ওয়াকিবহাল নন। ফলে এঁরা প্রায়ই বিক্ষুব্ধ থাকেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েন।

এর পরে এল ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্রের পালা। কেন্দ্রগুলি জনসাধারণের মধ্যে নির্ভরশীলতা গড়ে তুললেও এই প্রচেষ্টা বেশি দিন চালানো গেল না—প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হ'ল; ফলে জনসাধারণের নিজস্ব উৎসাহ উদ্যোগেও ভাঁটা পড়ল।

এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কেবলমাত্র পেশাদার চিকিৎসকের দ্বারাই গ্রামের জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী সফল করে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকেরা তাঁদের একচেটিয়া কারবারে ভাঙ্গন মেনে নিতে কখনই রাজী নন—এখনও না।

শেষ পর্যন্ত বিদেশী ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থাগুলির সহায়তায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিভাগ সহায়ক স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে চিকিৎসার কাজে লাগাতে শুরু করেছে। যে সমস্ত দেশে আজ এঁরা আংশিক সুযোগও পাচ্ছেন সেখানকার গ্রামে ও মফস্বল শহরে স্বাস্থ্য বিষয়ে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছেন। পুরোপুরি সুযোগ পেলে এঁরা যে

অপরিসীম অবদান রাখতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজনীতি ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও এর পথে বাধা স্বরূপ।

জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীতে আমার অভিজ্ঞতা পশ্চিম মেকসিকোর সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে বিগত বার বছর ধরে আমি স্থানীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীদের শিক্ষাদানে রত এবং যেখানে গ্রামের লোকজনের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রাথমিক চিকিৎসা সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করছি। কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব জনসাধারণ গ্রহণ করায় আমার নিজস্ব অংশগ্রহণ কমিয়ে মাসে মধ্যে এঁদের প্রয়োজনমত সমস্যাবলীর প্রতি নজর দেওয়ার ফলে লাটিন আমেরিকার অন্যান্য প্রান্তের প্রাচীন স্বাস্থ্য কর্মসূচী সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হ'তে পারছি।

গত বছর আমি ও আমার সহকর্মীরা লাটিন আমেরিকার নটি দেশের (মেকিসকো, গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস, এল, সালভাডর, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, ভেনেজুয়ালা, কলাম্বিয়া, ইকুয়েডার) চল্লিশটি সরকারী ও বেসরকারী প্রকল্প পরিদর্শন করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় উৎসাহদান, সাথে সাথে মতামত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, পদ্ধতি ও সমস্যাকে কাছাকাছি এনে স্বাস্থ্য পরিকল্পনাকারী ও শিক্ষকদের জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করা যাতে একে অপরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে পারে। আমরা বিশেষ করে সেই সমস্ত কেন্দ্রই বেছে নিয়েছিলাম যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরাই তাঁদের কর্মসূচী পরিচালনা করছেন অথবা সেই সমস্ত কেন্দ্র যেখানে স্থানীয় জনসাধারণ স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

কয়েকটি কেন্দ্র যেমন আমাদের গভীরভাবে উৎসাহিত করেছে তেমনি আবার কয়েকটি কেন্দ্র আমাদের সমানভাবে বিচলিতও করেছে। যেমন, কয়েকটি প্রকল্পে দেখেছি যে রোগনিয়ন্ত্রণে জনসাধারণকে অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে আবার অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখেছি ঠিক তার বিপরীত। এই সমস্ত কর্মসূচীকে আমরা দুটি বিপরীত দৃষ্টি-কোণের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে পারি—একটি, সমাজ-সহায়ক (Community Supportive), অপরটি সমাজ নিপীড়নমূলক (Community Oppresive)।

সমাজ-সহায়ক কর্মসূচী জনকল্যাণে সুদূর-প্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করে যা প্রকৃত দায়িত্ববোধে, উৎসাহে, সিদ্ধান্তগ্রহণে ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে, আর প্রকৃত অর্থে ই মানবিক মর্যাদা সৃষ্টি করে।

সমাজ নিপীড়নমূলক কর্মসূচীতে সমাজ কল্যাণের বুলি আওড়ান হয় বটে কিন্তু এটা মূলত কর্তৃত্ববাদী, পিতৃতান্ত্রিক আর এর কাঠামোটাই এমন যা প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত পর-নির্ভরশীলতা, দাসমনোবৃত্তি এব বিনা প্রশ্নে বিধি নিয়ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখায়, যার সুদূর-প্রসারী ফলাফল হ'ল সমাজ প্রগতির ধারাকে পঙ্গু করে তোলা।

এটা ভাবতে খুবই অবাক লাগে যে, কয়েকটি ছোটখাট বেসরকারী প্রচেষ্টার ব্যতিক্রম বাদে সমস্ত চালু সমাজ-সহায়ক প্রকল্পগুলিও অন্যান্য ছকে বাঁধা কর্মসূচীকে অনুসরণ করে এবং ফলে স্বাভাবিক কারণেই তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়ে দাঁড়ায়।

বড়সর আঞ্চলিক অথবা জাতীয় কর্মসূচী, যেখানে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অঢেল টাকাপয়সা দিয়ে থাকে, উঁচু-দরের বিদেশী বিশেষজ্ঞ আসেন, চকচকে কাগজের ইস্তাহারে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয় সেখানে বাস্তবে সাধারণ মানুষ খুব কমই সংশ্লিষ্ট থাকেন। বরং এই কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে কর্তৃত্ব আরোপ করা, সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া এবং আরও বেশি পরনির্ভরশীল করে তোলা হয় আর এর ফলে জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্যোগ নষ্ট হয়।

লাটিন আমেরিকার গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মসূচী পরিদর্শন করে আমরা জেনেছি যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীরা জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন। সাধারণত এঁদেরকে দু ভাগে ভাগ করা যায়:

॥ সহায়ক ধাত্রী বা স্বাস্থ্য কারিগর ॥	॥ স্বাস্থ্য সহায়ক বা গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী ॥
ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ১-২ বছরের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।	গড়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যান্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত এবং ১-৬ মাসের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।
সাধারণত সেই সমাজের বাইরের লোক।	সেই সমাজের ভেতর থেকে নির্বাচিত।
সাধারণত সর্বক্ষণের কর্মী।	আংশিকভাবে কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন।

সাধারণত এই প্রকল্প থেকেই   সনাতন চিকিৎসকদের মধ্যে
বেতন পেয়ে থাকেন।   থেকেও কেউ হতে পারেন।

এই সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও লাটিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশেই পুরণো ধাত্রীদের ন্যূনতম প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সমস্ত কর্মসূচীর প্রতি স্বাস্থ্য বিভাগের সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে যখন একে "পুরণো ধাত্রী নিয়ন্ত্রণ" বলে অভিহিত করা হয়। 'মশক নিয়ন্ত্রণ' আর 'কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ'-এর সাথে সরকারী প্রচেষ্টায় ধাত্রী নিয়ন্ত্রণও যুক্ত হয় (আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে বেশিরভাগ ধাত্রীই এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন না)। কিন্তু, ছোটখাট বেসরকারী প্রকল্পে এই শ্রেণীর স্বাস্থ্য কর্মীরা কি অসীম সম্ভাবনামূলক তার কিছু নজিরও আছে। এই রকম একটি প্রকল্পে তাঁরা নিজেদের ক্লাব তৈরি করেছেন এবং জ্ঞান বাড়ানোর জন্য নিজেরা উদ্যোগী হয়ে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে নিয়মিত যাতায়াত করেন।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীর কি কি দক্ষতা থাকতে পারে? কতটা সুষ্ঠুভাবে সে তা পালন করতে পারে? কি কি সীমাবদ্ধতা তার আছে?

বিভিন্ন গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মসূচী পরিদর্শন করতে গিয়ে আমরা অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। কোথাও কোথাও স্থানীয় স্বল্পশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীই একদিকে আরোগ্যদায়ী অপরদিকে প্রতিষেধক চিকিৎসায়, একই সাথে কৃষিকর্মে গ্রামীণ সমবায়ে, শিক্ষায় ও গতিময়তায় আশ্চর্যজনক ক্ষমতা অর্জন করেছেন। অন্যদিকে স্বাস্থ্যবিভাগ পরিচালিত কেন্দ্রে কর্মীদের এই সমস্ত কাজে নিরুৎসাহিত করা হয়। আরোগ্যের চেয়ে প্রতিষেধ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ (যা আমাদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু একটি রোগাক্রান্ত শিশুর মায়ের কাছে অর্থবহ নয়) এই মহৎ যুক্তিটি দিয়ে সময় বিশেষে পেশাদার চিকিৎসকের স্বার্থই রক্ষিত হয়, আর গ্রামীণ কর্মীরা যা ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করে ফেলেছে তার চেয়ে বেশি শিক্ষকও শেখান না; ফলে সাধারণের চোখে স্বাস্থ্যকর্মীরা এত কম কার্যকরী যে এমন কি প্রতিষেধ ব্যবস্থাতেও তাদের ওপর জনসাধারণ আস্থা পোষণ করেন না।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মীরা কি করতে পারে তা প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ অবস্থার চাইতেও বেশি বাহ্যিক কারণের ওপর।

বিভিন্ন কর্মসূচীতে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীর ক্ষমতার ব্যাপ্তি ও ধরণ, ব্যক্তিগত সম্ভাবনা স্থানীয় পরিস্থিতি অথবা আর্থিক দিকের চাইতেও অনেক বেশি নির্ভর করে স্বাস্থ্য কর্মসূচী বিষয়ে পরিকল্পনাকারী, উপদেষ্টা ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও ধ্যানধারণার ওপর। "নিজেরাই নিজেদের প্রকল্পে সিদ্ধান্ত নিন" এই আপ্তবাক্যটি বহুবার উচ্চারিত হলেও কি শেখা হল, আর কি করতে বলা হল এই বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মীর বক্তব্য থাকলেও তা প্রায়ই বলা চলে না।

যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখি তা'হলে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীর সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা অর্থাৎ, সে কি করতে অনুমতি পেয়েছে আর সে কি করতে পারে তা সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যায়। অন্যান্য অনেক দেশের মতই লাটিন আমেরিকার দরিদ্র জনসাধারণের ব্যাপক হারে ব্যাধি আর মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বল্প সাক্ষরতা ও জন্মহার বৃদ্ধি। কিন্তু এটা আমরা সকলেই জানি যে এর অন্তর্নিহিত কারণ অথবা আরও নির্দিষ্ট করে প্রাথমিক ব্যাধিটিই হল সম্পদের, জমির, শিক্ষার সুযোগের, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের এবং মানবাধিকারের বৈষম্য। এই বৈষম্য কৃষকের আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করে, আগামী দিনের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা ক্রমেই বেশি করে কর্তৃত্ব আরোপ করার দিকে এগোয় যার ঠেলায় গ্রামের গরীবেরা সাহায্য ও শোষণ উভয়ই নির্বাকভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু, দেশী, বিদেশী ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও ত' লাটিন আমেরিকার গরীব মানুষেরা আরও গরীব হচ্ছে এবং বিত্তবান অংশ আরও বিত্তশালী হচ্ছে। যাঁরা গ্রামের মানুষের সাথে অথবা বস্তীবাসীদের সাথে ওঠাবসা করেছেন তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে আরোগ্য চিকিৎসা বা রোগ প্রতিষেধের চাইতেও মানুষের স্বাস্থ্য অনেক বেশি নির্ভর করে রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর ওপর, জমি ও সম্পদের বন্টনের ওপর।

রাজনৈতিক প্রশ্ন নিঃসন্দেহে সমাজ সহায়ক কর্মসূচীর একটি বড় বাধা। এটা যেমন গ্রামীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমনি জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও সত্য। গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে সমাজ সহায়ক কর্মসূচী নেওয়া যাবে কি না তা নির্ধারিত হয় সেই দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারাই।

একজন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীর প্রশিক্ষণ ও কাজকর্মের

তাৎপর্য্য : গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী যদি বেশ কয়েকটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে থাকেন, যদি তাঁর চিন্তাভাবনায় উৎসাহ দেওয়া যায়, স্বীয় উদ্যোগ ও শেখার বিষয়ে আগ্রহ দেখানো যায়, যদি তাঁর বিচার বিবেচনাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখা হয়, তিনি যা জানেন এবং যা করতে পারেন তার ওপর যদি তাঁর ক্ষমতা নির্ভর করে তাহলে তিনি শক্তি ও উৎসাহ পেতে পারেন, যার দ্বারা তিনি সমাজে কিছু অবদান রাখতে পারেন এবং জনসাধারণের ভালবাসাও আস্থা অর্জনে সক্ষম হতে পারেন। নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করা যায়, নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করা যায়, এবং এইভাবে উন্নতি করা সম্ভব, এই আদর্শের নজির তিনি চারপাশে তুলে ধরেন। এইভাবে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী ভেতরে ভেতরে পরিবর্তন ঘটান কেবলমাত্র জনস্বাস্থ্যের বিষয়েই নয়, মানুষের অসীম সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে তোলার বিষয়েও .. চূড়ান্ত বিচারে প্রকৃত মানবাধিকারের জন্য।

যাই হোক, যেখানে সামাজিক ও ভূমি সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন, যেখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে নিপীড়ণ ও সম্পদের চূড়ান্ত বৈষম্য, যেখানে স্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষমতা আগলে বসে আছে, সেখানে এইমাত্র আমি যে স্বাস্থ্যকর্মীর কথা বললাম তিনি অনেকবেশি জানতে আগ্রহী, সজীব ও চিন্তাশীল। এই সব লোকেরা নিতান্তই বিপজ্জনক! এরাই হল সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার।

কিন্তু আমরা যে ধরনের গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী দেখে থাকি তাদের দক্ষতার পরিধি নিতান্তই কম, যাদের শেখানো হয়েছে চিন্তাশক্তি রহিত হতে, যাদের শেখানো হয়েছে নির্দেশনামার তালিকাটি অনুসরণ করতে, যারা পরিচ্ছন্ন পোষাক, ভাল ডিপ্লোমা আর সিমেন্টের ঘেরাটোপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বাস করে, যাদের সীমিত পরিচালন ক্ষমতা ও পূর্বনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা বর্তমান, স্বাস্থ্যের ওপর খুবই সীমিত তাদের প্রভাব তার চেয়েও কম তাদের আগ্রহ সামগ্রিক উন্নয়নে। এই সমস্ত কর্মীরা, বিশেষ করে, এদের মধ্যে মেয়েরা, বেশিরভাগ সময়ই দরখাস্ত করে সময় কাটায়।

গত ডিসেম্বরে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত উন্নতিশীল দেশগুলির স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে যথাযথ কারিগরি (Appropriate Technology) বিষয়ের সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানেও এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে, 'কারিগরিকে তখনই সঠিক বলব যদি তা সম্পদ ও ক্ষমতার বণ্টনে পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে"। যদি মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করাই আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে একইরকমভাবে আমরা বলতে পারি স্বাস্থ্য প্রকল্প ও স্বাস্থ্য কর্মীরা তখনই যথাযথ মূল্যবান যখন শক্তি ও সম্পদের সুস্থ বণ্টনে তারা সহায়তা করে।

আমরা প্রায়ই বলি আরোগ্যের চেয়ে প্রতিষেধ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কতদূর যেতে পারি? উদরাময়ের কথাই ধরা যাক না।

প্রতি বছর কৃষকদের ঘরে লক্ষ লক্ষ শিশু উদরাময়ে প্রাণ হারায়। প্রতিষেধক ব্যবস্থা থাকলে এর মধ্যে বেশিরভাগ মৃত্যুই হত না। তবুও লাটিন আমেরিকা এবং বেশিরভাগ উন্নতিশীল দেশেই উদরাময় হ'ল শিশুদের এক নম্বর খুনে। এর মানে কি এই যে তথাকথিত 'প্রতিষেধ' ব্যবস্থা সমস্যার কেবলমাত্র আংশিক উপশম ঘটায়? আজ সারা বিশ্বের সমস্যা উদরাময় জনিত মৃত্যুর প্রকৃত কারণের কি কি আমরা বুঝেছি, আর কিই বা আমরা করেছি....

....চিকিৎসার মাধ্যমে মৃত্যুর হার কমিয়েছি?

....শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থার মাধ্যমে সংক্রমণ চক্রটি ভাঙ্গতে পেরেছি?

....পুষ্টিকর খাদ্যের মাধ্যমে উদরাময়ের ঝুঁকি কমিয়েছি?

....অথবা, ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে জমির মালিকানার বৈষম্য দূর করেছি?

ভূমি সংস্কারই সমস্যাটির অন্তর্নিহিত কারণের কাছাকাছি। কিন্তু কৃষকেরা জমির মালিকানায় বৈষম্য ছাড়াও আরও নানা বৈষম্যের পীড়নে নিষ্পেষিত। এই ক্ষমতার কাঠামো ধ্বংসাত্মক বৈষম্যের ওপরই অবস্থিত। যে ক্ষমতার কাঠামোয় আছে স্থানীয়, জাতীয়, বিদেশী ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী ছাড়াও এর মধ্যে আছে আইনজীবি ও চিকিৎসাবিদ। সংক্ষেপে এরাই হ'লাম আমরা।

উদরাময়ে আক্রান্ত শিশু ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতব ব্যক্তিদের পক্ষে আইনে স্বীকৃত বৈষম্যের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আমরা মানবপ্রকৃতির যে দুঃখজনক অধোগতির সম্মুখীন হই তা হ'ল লোভ।

তাহ'লে প্রতিষেধ ব্যবস্থা কোথা থেকে শুরু হবে? সমস্ত প্রচলিত প্রতিষেধ ব্যবস্থাকে একত্রিত করে শিশু মৃত্যুর

হার যতটা কমানো যায় নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ'ল বর্তমান ক্ষমতাশীল কাঠামো যে বৈষম্য বজায় রেখেছে তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া। আমরা হয়ত শৌচাগার নির্মাণ অনুষ্ঠান, পুষ্টি কেন্দ্র, কৃষি প্রকল্প চালিয়ে যেতে পারি কিন্তু তাকে কোনোমতেই প্রতিষেধ ব্যবস্থা বলা যায় না। আমরা এখনও পর্যন্ত লক্ষণগুলিরই চিকিৎসা করে চলেছি মাত্র। আর আমরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক না থাকি তাহ'লে বাইরের সাহায্যের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা, কারিগরি ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সমস্যার আরও অবনতি ঘটবে।

কিন্তু এমন নাও হতে পারে। যদি শৌচাগার নির্মাণ জনসাধারণকে কাছাকাছি আনে এবং আরও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে সাহায্য করে, যদি পুষ্টি কেন্দ্র কমিউনিটি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় আর স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য করে, এবং কৃষিকাজের উন্নয়ন বাইরের কারিগরি না চাপিয়ে জমিতে কাজে লাগায়, জনগণের সম্ভাবনা ও তাদের অধিকার সম্পর্কে ভেতর থেকেই উৎসাহিত করে তোলে....তাহলেই এবং কেবলমাত্র তাহলেই শৌচাগার নির্মান, পুষ্টিকেন্দ্র, এবং তথাকথিত উন্নয়নের মধ্য দিয়েও ব্যাধি আর মৃত্যুর কারণগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব।

এখানেই গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীর গুরুত্ব। সে উদরাময়ের চিকিৎসায় না শৌচাগার নির্মাণে বেশিক্ষণ ব্যয় করল সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমস্যার গভীরে গেলে দেখা যাবে যে উভয়েই সমস্যার প্রশমনে সাহায্য করে। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হ'ল সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে শেখা।

হ্যাঁ, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল প্রতিষেধ ব্যবস্থাকে জোরদার করা। কিন্তু প্রতিষেধ ব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ হল নির্দয় বৈষম্যের অবসান ঘটানো, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে জনসাধারণকে সহায়তা করা, কেবলমাত্র বাইরের শোষণ ও নিপীড়ণ থেকেই নয় সংকীর্ণ দৃষ্টি, ব্যর্থতা আর লোভ থেকেও নিজেদের মুক্ত করা।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীর মুখ্য ভূমিকা হল মুক্তির দিশারী হওয়া। এর অর্থ এই নয় যে তাকে একজন বিপ্লবী হতে হবে (যদিও সে অবশেষে সেই অবস্থানেই হয়ত যাবে), জনকল্যাণে তার উৎসাহ থাকলেই চলবে। লাটিন আমেরিকার রক্তাক্ত ইতিহাসই এর সাক্ষী যে, বিকাশবিহীন বিপ্লব প্রায়ই একটি ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর পরিবর্তে আর একটি ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীকে আহ্বান করে। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের একমাত্র বিকল্প হ'ল মানবসম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ স্বার্থের পরিবর্তে ধৈর্য, সহানুভূতি আর মানবপ্রেম দ্বারা পরিচালিত হওয়া।

আমি জানি, এই কথাগুলি অনেকটা স্বপ্নবিলাসের মতই শোনাচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে আশার কথা হ'ল লাটিন আমেরিকার অন্তত কয়েকটি কর্মসূচীতে এটা মূর্ত হয়েছে--যেখানে স্বাস্থ্য প্রকল্প জনসাধারণের জন্য এবং জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত, যেখানে স্বাস্থ্য কর্মীরা মানবতাবোধের সহায়তা করে, ... ।

....

শেষ করার আগে কয়েকটি ভুল ধারণাকে আমি পরিষ্কার করতে চাই।

অনেকেই আছেন যাঁরা এখনও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীকে চিকিৎসকের অস্থায়ী বিকল্প হিসেবে মনে করেন...যেন আর্থিক দিক থেকে সম্ভব হলেই অধিক সংখ্যায় চিকিৎসক থাকবেন আর অল্প কয়েকজন থাকবেন স্বাস্থ্যকর্মী।

আমি এর সাথে দ্বিমত পোষণ করি। বার বছর ধরে কাজ করে এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছ থেকে শিখে ও চিকিৎসকদের সাথে চলে আমি এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছি যে স্বাস্থ্য কর্মীদের ভূমিকা শুধু সুনির্দিষ্টভাবেই পৃথক নয় স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হয়ত খেয়াল করে থাকবেন যে স্বাস্থ্যকর্মীদের আমি কখনই সহায়ক বলি নি। বরং এই দলের একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবেই আমি তাদের মনে করি। স্বাস্থ্য প্রকল্পের গোড়ার সারি, যেখানে প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি, সেখানে থাকতেই সে কেবল ইচ্ছুক তাই নয় তার কাজ একজন মাঝারি চিকিৎসকের থেকেও অনেক বেশি দায়িত্বপূর্ণ। একজন চিকিৎসক যেমন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করে থাকেন কিন্তু একজন স্বাস্থ্যকর্মী কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই উদ্বিগ্ন তাই নয় তার উদ্বেগ গোটা সমাজ নিয়েই। সে কেবলমাত্র জনসাধারণের আশু প্রয়োজনই মেটায় না, তাদের সম্মুখ দৃষ্টিতেও সহায়তা করে, নিপীড়ণকে সমষ্টিগত উদ্যোগে জয় করে আর ব্যাধির প্রকোপ শুরু হওয়ার আগেই তা খতম করে। জ্ঞান কুক্ষিগত করার চেয়ে তা সে ভাগ করে নেয় কেবলমাত্র এই জন্য নয় যে অজ্ঞতা আর পরনির্ভরতার চাইতে জেনে বুঝে

স্বাস্থ্য প্রকল্পে অংশগ্রহণ করা স্বাস্থ্য কর্মসূচীর পক্ষে অনুপন্থী বরং এই জন্যই যে ভাবের আদান-প্রদান মানুষের কল্যাণের একেবারে গোড়ার কথা।

সম্ভবত একজন চিকিৎসাবিদ ও স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে ফারাক হল স্বাস্থ্যকর্মী সেই সমাজেরই একজন সদস্য এবং তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি যে তার সর্বশক্তি উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করে কিন্তু জনসাধারণের রক্ত শোষণ করে না। এর মানে এই নয় যে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী অর্থলোভী আর দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে না—কারণ সেও ত আমাদের মতই একজন রক্তমাংসের মানুষ—পারে না তার কারণ হল গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীর পক্ষে অপরের ব্যাধি আর দুর্ভাগ্য নিয়ে নিজের মেদ বৃদ্ধি করার সামাজিক স্বীকৃতি এখনও অর্জন করা সম্ভব হয় নি।

আমি যদি কিঞ্চিৎ তিক্ত মন্তব্য করে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনিও যদি মেকসিকোর গ্রামে বার বছর কাটান তা হলে হয়ত পেশাদার চিকিৎসকদের শোষণে বিচলিত না হয়ে পারবেন না। নজীর হিসেবে বলা যেতে পারে প্রধান গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী ও গ্রামের মধ্যে সমন্বয়কারী ব্যক্তি মার্টিনের ভাইয়ের পাকস্থলীতে গুলি লেগেছিল; শহরে আসতে হয়েছিল এমার্জেন্সী অস্ত্রোপচারের জন্য। এই অস্ত্রোপচারের জন্য সার্জেন দাবী করে ২০,০০০ পেসস (১০০০ ডলার) কিন্তু অন্যান্য গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীর মতই মার্টিন ১৬০০ পেসস (৮০ ডলার) রোজগার করে—দু ঘণ্টার এই অস্ত্রোপচারের দক্ষিণা শুনে ত মার্টিন বিস্ময়ে হতবাক। এই টাকা জোগাড় করার জন্য এখন মার্টিনকে দু'মাস স্বাস্থ্য কর্মসূচী ছেড়ে শহরে রোজগার করতে হবে। এই কি মানবতাবোধ সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী?

না স্বাস্থ্য কর্মী কেবল সাহায্যকারী বা চিকিৎসাবিদেরই বিকল্প নয়, তার কাজ শুধু চিকিৎসককে সহায়তা করা তাই নয়, তার কাজ হল জনগণের সেবা করা।

একদিন নিশ্চয়ই আসবে যখন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মীকে দেখা হবে স্বাস্থ্যদলের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য হিসেবে আর চিকিৎসাবিদদের দেখা হবে সহায়ক হিসেবে। প্রয়োজনে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মী উপদেশের জন্য ডেকে পাঠাবেন উন্নত আরোগ্যমূলক চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাবিদকে।

তিনি শতকরা ২-৩ ভাগ রোগীকে দেখবেন যাদের চিকিৎসা স্বাস্থ্য কর্মীর আয়ত্বের বাইরে। এমনকি স্বাস্থ্য কর্মী চিকিৎসা-বিদ্যার একটি ছোট্ট অঞ্চল যেমন মেডিসিনে এই চিকিৎসকের মাধ্যমে ওয়াকিবহাল হতে পারে।

স্বাস্থ্য প্রকল্পের প্রসারে তখনই সুস্থ অবস্থা আসবে যখন চিকিৎসাবিদেরা নেতৃত্বাধীন থাকবেন আর নেতৃত্ব দেবেন গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীরা।*

ডেভিড ওয়ার্ণার

অনুবাদক: পার্থসেন

*[মূল রচনাটি Voluntary Health Association of India (C14 Community Centre, Safderjung Development Area, New Delhi 110016) এর সৌজন্যে পাওয়া। গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র কিভাবে সংগঠিত হ'তে পারে, এগুলির ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যা আসে, সে সংক্রান্ত ধারণা পাওয়া যাবে ঢাকা (বাংলাদেশ) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজকর্মের রিপোর্ট থেকে। পরবর্তী সংখ্যায় এই কেন্দ্রের পরিচিতি থাকবে।]

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা:
(সাধারণ)—তিন টাকা
(সডাক)— সাড়ে চার টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা:
সম্পাদক,
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
C/o. ডি এস. এন্টারপ্রাইজেস
৫২/১সি, বি. বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে অভিজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।